– ওমা, একি! এ-দেখছি এমআইটিতে ভর্তির অফার, সঙ্গে ফুল বৃত্তির বিবরণ। কী করছিস রে ঋভু! প্রায় চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে ঋতি মিত্র।

– তোকে বলিনি দিদি। বাবা-মাকেও না। স্যাট দিতেই আমার দেড়টা বছর চলে গেছে, ফাঁকে টোয়েফলও; টোয়েফলটা ভিসার সময়ে লাগতে পারে। এবার বল, যেতে দিবিতো! মা কি রাজি হবেরে ঋতিদি?

খবর শুনে বাবার আনন্দের শেষ নেই। মায়ের মুখ ভার।

– কী বলো ঋতির মা! এদেশতো দূরঅস্তঃ–এশিয়ার ক'জনই-বা এমআইটিতে চান্স পায়? এমআইটি এখন পৃথিবীর চার-পাঁচটে ইউনিভার্সিটির একটি।

আগে স্ত্রীকে ঋদ্ধর মা-ই বলতেন দেবেন বাবু । এখন আর ঋদ্ধর নাম তেমন বেশি উচ্চারিত হয় না মিত্রবাড়িতে।

– যাই-ই বলো, এই বয়সে ছেলেটা এত দূরে যাবে! ভাবতেই বুকটা কেমন খালি-খালি লাগে।

ঋভুর মতো ছেলেদের জন্য হয়তো এমআইটি কিংবা আইআইটি-ই উপযোগী। মায়ের আপত্তি এক্ষেত্রে কোনও বাধা হয় না। বুয়েটের পার্ট চুকিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি স্টেটসে চলে যায় ঋভু। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর আর ফেব্রুয়ারি-মে-তে সেমিস্টার। তিনমাস থাকতে হবে নানা অবজার্ভেশনে। ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের কেমব্রিজ শহরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ধরন আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা। এখানে ভর্তির পরই স্টুডেন্টদের উদ্ভাবনী শক্তির মহড়া হয়–যার যেদিকে ঝোঁক, তাকে সেটিই দেয়া হয়; ওরা বলে, নিজেকে মেলে ধরার প্রয়াস। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে নতুন কিছু করে দেখাতে হয় দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। ঋভুদেরও তিনমাস এসব করতে হয়। ঋভু পায় এ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স–মনের মতোই সাবজেক্ট। দিদিকে কতবার এই ফিজিক্স দিয়েই হারাতে চেয়েছিলো ঋভু।

ঠিক দিদির মতোই একজনকে পেয়ে যায় ঋভু। ত্রিবেণী গরকড়ি–সার্ক স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। এ-অঞ্চলের সবাইকে আঁকড়ে রাখাই তার ব্রত। উইক-এন্ডে সবার জন্য নানা জায়গায় ট্যুর, খাওয়া-দাওয়া, এশিয়ানদের নিয়ে নানা আয়োজনের মধ্যমণি এই ত্রিবেণী গরকড়ি–কেরলের মেয়ে। থাকে চেন্নাই। ও লেভেল-এ লেভেল করেছে দিল্লিতে। এশিয়ান স্টুডেন্ট ফেডারেশনেরও যুগ্মসচিব এই ভারতীয় মেয়েটি–বিপদে-আপদে সকলকে আগলে রাখাই যেন ওর বড় কাজ। জানুয়ারি মাসটা ইনডেপেনডেন্স একটিভিটিস পিরিয়ড–যার যা ইচ্ছে; কাজ করে বাড়তি আয় করা যায়। ছোটখাটো কোর্স করে নতুন কিছু শেখা যায়। ঘুরেও কাটিয়ে দেয় কেউ। ঋভু কোনোটাই করে না। হুট করেই চলে আসে সে–তখন জানুয়ারির তিন তারিখ। বাবা দেবেন মিত্রতো অবাক–কী রে, কেমন করে এলি? যদিও ঋতিকে দু'দিন আগেই জানিয়েছে আসার কথা; বলেছে–কাউকে বলিস না দিদি।

– একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি আমাদের ন'-দশজনকে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই ধরো, টিকেট ফেয়ার, পকেটমানি–সবই দিয়েছে। আমাদের স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের ত্রিবেণীদি-ই এর আয়োজক। চেন্নাই-দিলি আর মুম্বাইতে ওর বাবা-কাকার বিশাল কর্পোরেট বিজনেস আছে। তারাই এসব খরচ করে।

সুলেখা মিত্রের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সেটা এক মাসেরও কম সময়ের। জানুয়ারির উনত্রিশের দিকে ঋভু আবার পাড়ি দেয় স্টেটসের কেমব্রিজ শহরে। যাওয়ার দু'-তিন আগে দিদিকে বলে–ত্রিবেণীদির সঙ্গে তোকে নিয়েই আমার যত গল্প। বয়সেও তোর মতোই দিদি, খুব ব্যস্ত থাকে মেয়েটা। ও কী বলেছে জানিস, দিদিকে বলো, এমবিবিএস ফাইনাল দিয়েই এখানে বেড়াতে আসবে; দেখে যাবে আমাদের। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। তখন বললো, দিদির ফেয়ার-টেয়ার সবটাই আমার ওপর ছেড়ে দাওতো ছেলে।

ঋভু আরও বলে–কী জানি, আগামী ছুটিতে হয়তো ঢাকায় চলে আসবে। এসেই বলবে, চলো আমার সঙ্গে চেন্নাই ঘুরে আসবে দিদিকে নিয়ে। বাবা-মাকে নিয়েও টান দিতে পারে তখন–যা সিরিয়াস মেয়ে!

সব শুনে ঋতি বলে–ত্রিবেণীকে পেয়ে আমাকে ভুলে যাবি নাকি!

মুহূর্তেই ভগ্নিকে জড়িয়ে ধরে ঋভু।

– এটা বলতে পারলি দিদি, আমি না তোর দু-চোখ। এই তুই, আমার প্রাণের প্রিয় দিদি; তুই না হলে আমার বাঁচা দায়।

অনেকক্ষণ ভাই বোনকে জড়িয়ে রাখে।

– পাগল। এমনিতেই তোকে খেপাচ্ছিলাম। তুই না বলিস, দিদিই আমার পৃথিবী।